সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ বিভেদমূলক মানসিকতার জন্ম দেয় এবং সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠীগত বিভেদ, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। অপরদিকে যেসব দেশে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেই সব দেশে এর তীব্রতা আরও বেশি। বর্তমান লিখিত ভাষণে বহু আলোচিত দুরূহ এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বিচার করার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ, এই সমস্যার কারণসমূহ ও তা নিরসন করার সার্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ,

আমাকে আপনাদের জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীকে রক্ষা করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে ঘোষণা কনভেনশনের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমি আমার সম্পূর্ণ সর্মথন জানাইতেছি। কনভেনশনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া অংশগ্রহণ করিতে পারিলে আমি আনন্দিত হইতাম। কিন্তু বিশেষ কার্যবশত আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইল না। সেইহেতু আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমার অভিমত আমি আপনাদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিতেছি। আমি এই উপলক্ষ্যে আমার পক্ষ হইতে এবং আমাদের দল 'সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া'র পক্ষ হইতে জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশানের প্রতি সৌভ্রাত্রসূচক অভিনন্দন জানাইয়া ইহার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

শুধুমাত্র মানবিক আবেদনে কাজ হইবে না

বন্ধুগণ, সমস্যার গুরুত্বটি কোনক্রমেই লঘু করিয়া দেখা চলে না। আমাদের জনগণের স্বার্থে যাহা জরুরি প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ন্যায় বিপজ্জনক একটি সামাজিক ব্যাধির কারণ অনুধাবন এবং তাহার প্রতিকারার্থে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ। যদি এই জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশান কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলির নিন্দা করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখিবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াই ইহার কর্তব্য শেষ করে তাহা হইলে ইহার বিঘোষিত উদ্দেশ্য পরিপূরণে ইহা ব্যর্থ হইবে। কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে নিন্দা করিয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর মহিমার জয়গান করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে ভাষণ দান করিলেই যদি সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমাধান হইত তাহা হইলে বহুকাল পূর্বেই আমাদের দেশে এ সমস্যা মিটিয়া যাইত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী নেতৃবৃন্দ, যাঁহারা বিপুলভাবে সমস্ত ভারতীয় জনসাধারণের সন্দেহাতীত আস্থা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কি একইভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করেন নাই এবং এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তির মহিমার জয়গান করেন নাই? এই সমস্ত বক্তৃতা ও ভাষণের ফল কতটুকু পাওয়া গিয়াছে? তখনও আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্য হইতে যতখানি দূরে ছিলাম, আজও ততখানি দূরেই রহিয়া গিয়াছি। এখনও আমাদের জনগণের উপর সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক প্রভাব বিদ্যমান। এখনও পূর্বের ন্যায় সামান্যতম প্ররোচনাতেই সাম্প্রদায়িকতা জঘন্যতম হিংস্রতা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার কারণ এ নহে যে এই সমস্ত নেতাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল। পরন্তু এ সমস্যার মূল উৎসস্থান অনুধাবন করা এবং তাহার সমাধানে সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অক্ষমতাই প্রধানত ইহার কারণ। তাঁহাদের ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও যখন কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থ, ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের নামে আবেদন করিয়াও সাম্প্রদায়িকতাকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই, তখন একই পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং আমাদের দেশের অসম্পূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার কষ্টকর পন্থা এড়াইয়া গিয়া আমরাও কোন সুফলই আশা করিতে পারি না।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণই একমাত্র পথ

বন্ধুগণ, যদি আমার আন্তরিক বিশ্বাসের অভিব্যক্তি আপনাদের মধ্যে কাহারও অনুভূতিকে বিন্দুমাত্র আঘাত করে তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভুল বুঝিবেন না। একজন ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসাবে,সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণাম সর্ম্পকে আপনাদের উৎকণ্ঠা এবং দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন হইতে এগুলির মূলোৎপাটনে আপনাদের দৃঢ়সংকল্প মনোভাবের অংশীদার হিসাবে, আমি আপনাদের নিকট বিনীতভাবে আপনাদের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারমুক্ত মনোভাব কামনা করি। আমার অভিমত অগ্রাহ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু তাহা প্রত্যাখানের পূর্বে অনুগ্রহপূর্বক তাহা ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, শুধু এইটুকুই আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ। গত অক্টোবর মাসে কলিকাতায় দিল্লি হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশানে কয়েকজন বিশিষ্ট সংগঠকের ভাষণ শোনার এবং কনভেনশানের খসড়া ইস্তাহার পড়িবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমার অভিমতে, জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক কনভেশানের এই সব নেতৃগণ ও সংগঠকবৃন্দ ধর্মীয় সহনশীলতা, শুভবুদ্ধি ও জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগ্রত করার জন্য শুধুমাত্র মানবিক আবেদনের প্রতি নির্ভর করিয়াই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন । এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের আন্তরিকতায় সন্দেহ না করিয়াও আমি ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাঁহারা যে পথ গ্রহণ করিতেছেন তাহা বিফল হইতে বাধ্য যেমন ইহা পূর্বেও ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ ইহা অবৈজ্ঞানিক পন্থা। প্রায় সমস্ত ধর্মের মহাপুরুষেরাই কি আমাদের ধর্মীয় সহনশীলতা অনুশীলনের শিক্ষা দেন নাই? এতদ্‌সত্বেও আমাদের সামাজিক - রাজনৈতিক জীবন হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ অপসারণে তাঁহাদের উপদেশাবলী কোনও কাজে লাগে নাই। ইহার কারণ তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব নহে। ইহার কারণ সমস্যা অনুধাবনে এবং ইহার সমাধানের সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে তাঁহাদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। ইহা উপলব্ধি করা অবশ্য প্রয়োজন যে, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুতরাং যদি সত্য সত্যই ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহার মূলোৎপাটনের জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। শুধুমাত্র ধর্মীয় সহনশীলতার আবেদনের দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। পরন্তু সঠিক পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামগুলি গড়িয়া তোলার মারফৎ ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটিতে থাকিবে ও ধর্মীয় সহনশীলতা আসিবে।

জাতীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা

মূল বিষয়ে আসিবার পূর্বে, আমি মনে করি, আমার সর্বশক্তি দিয়া হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সেই অংশকে নিন্দা করা কর্তব্য যাঁহারা ইতিহাসের নামে ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয় একাত্মীকরণ তো দূরের কথা, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনই সম্ভব নহে। ইঁহারা হইতেছেন দুই সম্প্রদায়ের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। যত উচ্চৈঃস্বরে, যত জোরের সঙ্গেই এই কথা বলা হউক না কেন, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং ঘটনার দ্বারাও প্রমাণিত নহে। ইহা হিংস্র পশুর ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়া আর কিছুই নহে। এ সত্য কে অস্বীকার করিতে পারে যে, বর্মার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বর্মার জনগণ একটি জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে! ইন্দোনেশীয় জনগণের ব্যাপক অংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার জনগণও একটি জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। চীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে মুসলিম জনসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তা সত্ত্বেও চীনা ও সোভিয়েট জনগণ এক অখন্ড জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত বা পাকিস্তানে যেরূপ কিছুকাল অন্তর অন্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, এ সমস্ত দেশের কোনওটিতেই সেরূপ ঘটে না। এ সমস্ত দেশের কোনওটিতেই মুসলিম জনতা পৃথক জাতীয় সত্তা দাবি করে নাই বা করে না — যেরূপ প্রাক্‌বিভক্ত ভারতের মুসলিম জনতার পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ দাবি করিয়াছে।

এ সমস্ত দেশের কোনও একটি দেশও আমাদের ন্যায় মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত হয় নাই। আমি জানি এরূপ যুক্তি উঠিতে পারে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের ঔপনিবেশিক শাসন

চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়ে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এদেশে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি চালু করিয়াছিল এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম জনতাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লইয়া গিয়াছিল। নিঃসন্দেহে ইহা সত্য। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি কি বর্মার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করে নাই? ইহা কি সত্য নহে যে, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরাও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী ইন্দোনেশীয় জনগণের ঐক্যে ভাঙন ধরাইবার প্রচেষ্টায় ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের অপেক্ষা কোনও অংশে কম উদ্যোগী ছিল না? তাহা হইলে এতগুলি দেশের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই কেন সাম্প্রদায়িকতার এই বিশেষ সমস্যা, যাহার পরিণামে বারংবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়াছে, মুসলিম জনতা পৃথক জাতীয় সত্তা দাবি করিয়াছে এবং শেষপর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে হইয়াছে? ভারতীয় অবস্থার এই বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসকদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির দোহাই পাড়া আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নহে, এবং ইহার দ্বারা আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আগাগোড়া যে মৌলিক কতকগুলি দুর্বলতা ছিল - এ সত্য অস্বীকার করা হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করিবার অন্যতম উপায় হিসাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষত হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ চলার মত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য বিপর্যস্ত করিয়াছিল এবং তাহার দ্বারা ভারতবর্ষে জাতি গঠনের পথ বিঘ্নিত করিয়াছিল। তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নিকট হইতে ইহাপেক্ষা শ্রেয়তর কিছু আশা করা একমাত্র গন্ডমূর্খের পক্ষেই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ঔপনিবেশিক দেশেই সর্বদাই জাতীয়তাবিরোধী কতকগুলি শক্তি এবং গোষ্ঠী থাকে যাহারা সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসকামী এই জাতীয়তাবিরোধী অংশের প্রতিনিধি রাজা, নবাব, জমিদার, কম্প্রাডর বুর্জোয়া, উচ্চপদস্থ অফিসারগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা জানিত যে, তাহাদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রয়োজন। কাজেই এই সমস্ত গোষ্ঠী ও শক্তিগুলির পক্ষে জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নহে। এমতাবস্থায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারা হইতে মুসলিম জনতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাহাদের ব্যবহার করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ও তাহাদের দালালরা যে অপচেষ্টা চালাইবে, ইহা তো জানা কথাই ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সেই অপচেষ্টা রোধ করার জন্য আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কি কোন বাস্তবানুগ কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন? যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর দোষ চাপাইয়া আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহার দ্বারা সমস্যার আসল কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সেইহেতু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাস্ত করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তুলিতে আমরা কেন শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হইলাম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আজ আমাদের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

ভারতবর্ষে জাতি গঠনের ইতিহাস

এই ব্যর্থতার কারণ আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের স্বপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে একদল যত উচ্চৈঃস্বরেই দাবি করুন না কেন ইহা অত্যন্ত কঠোর বাস্তব সত্য যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষ কখনই রাজনৈতিক দিক হইতে একটি অখন্ড রাজ্য ছিল না। বাস্তবে সে সময়ে এখানে পৃথক পৃথক বহু রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কেবলমাত্র একেন্দ্রীভূত ব্রিটিশ শাসনের সময়ই ভারতবর্ষ একটি অখন্ড রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে গড়িয়া ওঠে যাহার মধ্য দিয়া আধুনিক সর্বভারতীয় চেতনা গড়িয়া ওঠার বাস্তব অবস্থা — যাহা এযাবৎকাল অবর্তমান ছিল — ইহার সৃষ্টি হয়। গোটা ভারতবর্ষের উপর একটি কেন্দ্রীভূত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা প্রর্বতনের ফলে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র স্থাপিত হইতে থাকে এবং বিভিন্ন উপজাতীয় অর্থনীতির সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান মারফত ধীরে ধীরে একটি জাতীয় বাজারের (ন্যাশনাল মার্কেট) সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় পুঁজির জন্ম হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলার কালে

ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতিসমূহ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়গুলি একত্রীভূত হইয়া একটি জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। যদি আমাদের দেশের এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বদলে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে থাকিত তাহা হইলে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভবপর হইত তাহাই নহে, উপরন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশকে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে লইয়া যাওয়া এবং জাতিগত, সাম্প্রদায়িক এবং বর্ণগত সমস্যারও চিরতরে সমাধান সম্ভব হইত, যেমন চীন বা সোভিয়েট ইউনিয়নে হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা এবং কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী রাজনৈতিক দলটির সুবিধাবাদী রাজনীতি ও কখনও কখনও এমনকী মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতেই রহিয়া গেল। এবং মূলত ইহারই দরুন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় নাই এবং আজও ইহার অস্তিত্ব বর্তমান।

জাতীয় নেতৃত্বের ধর্ম ও বর্ণগত ঐক্য স্থাপনে ব্যর্থতা

প্রথমত ইহা লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষে জাতিগঠনের ধারা শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ধনতন্ত্র একটি বিশ্বসামাজিক শক্তি হিসাবে শুধু তাহার বিপ্লবী চরিত্রই হারায় নাই, উপরন্তু তাহা নিশ্চিতভাবে বিপ্লববিরোধী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই সাধারণ লক্ষণটি ছাড়াও ভারতীয় ধনতন্ত্রের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। পশ্চিমী ধনতন্ত্রের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করার পরিবর্তে ভারতীয় ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বিদেশি লগ্নি-পুঁজির কর্তৃত্বাধীনে এবং সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া। যদিও স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী অংশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কারণ এদেশে তাহাদের শ্রেণী-শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতীয় জনগণকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করার পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এক দুরধিগম্য বাধা হিসাবে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের সকল ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের ন্যায় ইহারাও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের মারাত্মক ভয়ে ভীত ছিল। কারণ ইহাদের ভয় ছিল যে, যদি মুক্তির জন্য ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম সফল হয় তবে তাহা কেবল আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরই অবসান ঘটাইবে না, সাথে সাথে সংগ্রামের নেতৃত্ব হইতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে অপসারিত করিয়া অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিবে এবং ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনা নির্মূল করিবে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিরোধিতা এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের মারাত্মক ভয় ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী অংশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (রিফরমিস্ট অপজিশনাল) ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহার ভূমিকা ছিল সমান আপসমুখী। ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্র উভয়ের সঙ্গে আপস রফা করিয়াই গড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একীকরণের কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না এবং হয়ও নাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনাকালে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে একটি জাতিতে পরিণত হইল বটে, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য এবং ধর্মীয়বন্ধনের বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার দরুন ভারতীয় জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসাবেই টিকিয়া রহিল।

হিন্দুধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

ইহাই সব নহে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কেবল যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করিয়া জনসাধারণকে ধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ছিল তাহাই নহে, পক্ষান্তরে ইহা ধর্মকে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

সেইহেতু ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। এই ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ (রিলিজিয়ন ওরিয়েন্টেড ন্যাশনালিজম) অভিব্যক্ত হইয়াছিল হিন্দুধর্মের রিভাইভ্যালিজমের রূপে। এই হিন্দুত্ব পুনরুজ্জীবনবাদী (হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অ-হিন্দু জনতার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে প্রধানত ইহাই তাহাদের, বিশেষত মুসলিম জনতাকে এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য দায়ী। অধিকন্তু ইহার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ও জাতীয়তাবাদবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দালাল মুসলিম নেতাদের পক্ষে মুসলিম জনতাকে এ কথা বোঝানো অনেক সহজ হইয়াছে যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইলে হিন্দুদের স্বৈরাচারী শাসন অপেক্ষা ভিন্ন কিছু হইবে না, যেখানে মুসলিমদের কোনও নিরাপত্তা বা ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকিবে না। এমতাবস্থায় প্রাক-বিভাগ ভারতে মুসলিমরা যে পৃথক নিজস্ব দেশের দাবি তুলিয়াছিল তাহার জন্য নিজেদের ত্রুটির দিক লক্ষ না করিয়া সম্পূর্ণ দোষ কেবলমাত্র তাহাদের ঘাড়ে চাপানো কি ভুল হইবে না? আর শুধু মুসলিমদের কথাই বা বলি কেন? তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বেলাতেই বা কী হইয়াছে? সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে হিন্দুসমাজের পশ্চাদ্‌পদ অংশের জনসাধারণ শুধুমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কারেই আবদ্ধ থাকে নাই, উপরন্তু তাহাদিগকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং এই দিক হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এমনকী হিন্দু রিভাইভ্যালিজম-এর উদারনৈতিক রূপও প্রকাশ করিতে পারে নাই। গান্ধীজি ও অন্যান্য কতিপয় নেতার বর্ণগত (কাস্ট) বিভেদের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় (বাংলাদেশে কায়স্থ এবং বৈদ্য) এবং অন্যান্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের আধিপত্যের ভিত্তিতে হিন্দুত্ব পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন হইতে বাস্তবে কোন অবস্থাতেই আলাদা হইতে পারে নাই। ইহা অবশ্য সত্য যে, এই হিন্দু রিভাইভ্যালিজম ধর্ম সম্পর্কে তত্ত্বগত দিক হইতে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে তাহা পূর্বের তুলনায় সংকীর্ণ ও উগ্র মনোভাবের পরিবর্তে অন্যান্য ধর্মের প্রতি অধিকতর মানবতাবাদী ও উদার ছিল। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় ইহার কোন গুরুত্বই নাই। এখানে বক্তব্য হইতেছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষে যেখানে ধর্ম ও সমস্ত সামাজিক কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে জনসাধারণকে সংগঠিত করা একান্ত অপরিহার্য ছিল সেখানে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দুধর্মের সহনশীলতা ও উদারতার ভিত্তিতে তাহাদের একত্রিত করিয়া এক জাতি গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিল। একমাত্র এই কারণেই কাল-অনুপযোগী মধ্যযুগীয় ইসলামিক রীতিনীতি ও আচার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে 'খিলাফত' আন্দোলন এমনকী গণতান্ত্রিক তুরস্ক গঠনের প্রয়োজনে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কি জাতি পর্যন্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সহিত বর্জন করিয়াছিল; জাতীয় আন্দোলনের কর্মসূচিতে সেই খিলাফত-এর দাবিকে অর্ন্তভুক্ত করা ব্যতীত ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব মুসলিম জনসাধারণের আস্থা অর্জন করিবার অন্য কোন পন্থা বাহির করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্মের সহনশীলতা ও উদারতার ভিত্তিতে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব কর্তৃক মুসলিম জনসাধারণকে ভারতীয় জাতির মধ্যে সংহত করার এই সমস্ত প্রচেষ্টা, অথবা ইসলাম ধর্মীয় প্রথাগুলিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা যাহা গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের নীতির সহিত অসংগতিপূর্ণ- এই সমস্ত জিনিস মুসলিম জনসাধারণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিচ্ছেদের পথকেই কেবলমাত্র বিস্তৃততর করিয়াছে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ ধর্মীয় প্রথাগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, জাতি সমন্বিত জনসাধারণকে যথার্থভাবে সংহত করার মাধ্যমে একটি জাতি গঠন কখনও বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই সমস্ত প্রচেষ্টা সংহতির পথকেই বিঘ্নিত করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার পথে সমাজ গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ধর্মকে পুরোপুরি শক্তিহীন করিয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যথার্থ সংহত করিয়া জাতি গঠন সম্ভবপর। না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব, না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব গঠনের কথা যাঁহারা বলিতেন তাঁহারা — কেহই ভারতীয় জাতিগঠনের এই সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজগুলি সমাধা করেন নাই।

সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করিয়া একটি জাতিগঠন সম্ভব হয় নাই। নেতাদের পক্ষে আন্তরিকতার অভাবের জন্য ইহা হয় নাই তাহা নহে, আমার বক্তব্য হইতেছে, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতা ও ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিশেষত মুসলিম জনসাধারণকে আন্দোলনের সাথে

সামিল করিয়া একটি জাতিগঠনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আমি ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই অতীতের ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করিতেছি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি সফল করিবার জন্য যে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠা উচিত ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা গ্রহণ করার ফলেই তাহা তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা, অপরদিকে বহিঃক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণকে একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়া ইহা হিন্দুধর্মের উদারতা ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে সংহত করিয়া একটি জাতি গঠনে ব্রতী হইয়াছিল। এমনকী জাতীয় নেতৃত্ব ক্ষমতালাভের পূর্বে এই বিষয়ে যে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, ক্ষমতালাভের পরেও তাঁহারা তাহার সংশোধন করেন নাই। বরং আমাদের দেশের বর্তমান শাসকবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপূরিত কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং কুসংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ফলে সমাজবিরোধী শক্তি ও মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করিতেছেন। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আমরা দেখিতে পাই পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাস্তবে সমস্ত ধর্মের বিকাশে সমান উৎসাহ প্রদান এবং সমস্ত ধর্মাবলম্বী লোকদের ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্র কর্তৃক সমান সুযোগ প্রদানের নীতিতে পর্যবসিত করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, এই ধরনের পরিবেশেই হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্তানের দাবি বাস্তবে দৃঢ় ভিত্তি পাইতেছে। ইহা বোঝা উচিত যে, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে কোন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার পালন এবং ধর্মীয় প্রচারকে উৎসাহ প্রদান করা বোঝায় না। অথবা ইহার দ্বারা জনসাধারণের উপর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও বোঝায় না। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা কোন একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা কোনমতেই বোঝায় না। একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে নাগরিকদের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। সুতরাং উহা ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় প্রচারকে যেমন কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করে না, তেমনি প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে না। বিপরীতপক্ষে ইহা ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না এরূপ জনসাধারণ — উভয়েরই সমান অধিকারের নীতিকে কার্যত স্বীকার করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে সফল করার মধ্য দিয়া ইহা সমাজের গণতন্ত্রীকরণ সাধন করে এবং ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রের উপর হইতে ধর্মের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে। আমাদের দেশের বর্তমান বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট মনোভাবের ফলে আজও ভারতীয় জনসাধারণ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এবং উপজাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র। যখন পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিগুলি যাহারা সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক বিভেদমূলক আচার, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক আচার রীতিনীতির উপর চার্চের প্রভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সফল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারাও ধর্মীয় উন্মাদনা, বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গা (আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও গ্রেট ব্রিটেনে বর্ণভিত্তিক দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য) প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই, তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে যখন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণহিন্দু, তফসিল জাতি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খ্রিস্টান এবং অসমীয়া, বাঙালী, ওড়িয়া, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত দিক দিয়া বিভক্ত, তখন এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কত গভীরে নিহিত। সুতরাং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানোই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

আমি জানি, আপনারা কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এমনকী পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে তৎকালীন প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার পথে জাতি গঠিত হইয়াছে এবং বুর্জোয়া অর্থে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানো হইয়াছে সেখানে তাহা হইলে আজও বর্ণের ভিত্তিতে দাঙ্গা সংঘটিত হইতেছে কীরূপে? ইহার কারণ বাহির করিবার জন্য বেশি

দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক বিভেদমূলক আচার রীতিনীতি দূর করিয়া জনসাধারণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে জাতি গঠনের পদ্ধতি মূলত সমাধা হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত দেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিভেদ জাতীয় জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে কম প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজ গণতন্ত্রীকরণের যে কাজ নিজে সুরু করিয়াছিল তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সমাধা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পুঁজিবাদী শাসনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কিছু কিছু কর্মসূচি অপূরিত থাকিয়াই যায়। জাতি সমস্যা এবং বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক ঘোষিত সমানাধিকার প্রদানের নীতি এইরূপ অসম্পূর্ণ কাজ। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই যেখানে একাধিক জাতি (nationality) বিদ্যমান সেখানে অধিকতর প্রভাবশালী জাতি অন্য বা অন্যান্য জাতিসমূহকে দমন করে। সেইজন্য পুঁজিবাদের অধীনে জনসাধারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণে নিষ্পেষিত হয় না, উপরন্তু জাতিগত নিপীড়নও তাহাদের সহ্য করিতে হয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে বর্ণগত দাঙ্গা প্রভাবশালী জাতি কর্তৃক সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে এইরূপ দমনেরই অভিব্যক্তি। ইহা ছাড়াও যে পুঁজিবাদ ইহার বিকাশের এক বিশেষ স্তরে অর্থাৎ প্রথমটিতে জাতীয় সংহতি ও জাতিগঠনের তাগিদে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত জনসাধারণকে সংহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই পুঁজিবাদই আবার ইহার বিকাশের অন্য এক স্তরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিজেই জনগণের ঐক্যকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করিতেছে। পুঁজিবাদের সংকট যত তীব্রতর হইতেছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক জনতার সংগ্রাম যত সুতীব্র হইতেছে পুঁজিবাদ তত ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করিতেছে এবং পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনকে বিপথে পরিচালনার জন্য জনসাধারণের ধর্ম ও বর্ণগত মনোভাবকেও উস্কানি দিতেছে। এই কারণেই আমরা পশ্চিমের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্মীয় উন্মাদনা, বর্ণান্ধতা ও বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গার ক্রমবর্ধমান লক্ষণগুলির প্রকাশ আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং যতদিন পুঁজিবাদ টিকিয়া থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সম্প্রদায়গত, জাতিগত ও বর্ণগত প্রভৃতি জনবিরোধী মনোভাবের উৎপত্তির মূল কারণগুলিও থাকিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইবার ভিত্তিও সেখানে থাকিবে। যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনসাধারণ ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া পুঁজিবাদের প্রভাবকে খতম করিবে এবং সমাজতন্ত্রকে সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিগুলি সম্পূর্ণ সমাধা করিবে কেবলমাত্র তখনই জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং বর্ণগত সমস্যার পুরাপুরি সমাধান হইবে। যাঁহারা যথার্থই সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তজ্জনিত দাঙ্গার চিরতরে সমাধান চান তাঁহারা ইতিহাসের এই শিক্ষাকে অবশ্যই স্মরণে রাখিবেন এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হইবেন।

আশু কর্তব্য

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জনতা ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মারফত সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম না হয় ততদিন পর্যন্ত কি আমরা হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? না, তাহা হইলে উহা বোকামির চূড়ান্ত হইবে। যেহেতু ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ এবং যেহেতু পুঁজিবাদ সম্প্রদায়গত, জাতিগত ও বর্ণগত প্রভৃতি জনবিরোধী চিন্তা ও ভাবনাধারণার জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে এবং ইহা সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গার মূল কারণকে জিয়াইয়া রাখে, সেহেতু কিছুদিন অন্তর অন্তর আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবধারিত রূপে ঘটিবেই — এইরূপ কথা বলার অর্থ হইতেছে অদৃষ্টবাদের বা নেতিবাদের (fatalism) নিকট আত্মসমর্পণ করা। আমরা জানি কোন ঘটনাই অন্যান্য ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা ঘটনা নয়। তাই কোন কিছু ঘটিবার কারণ বর্তমান থাকিলেই যে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যাইবে এ ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ঘটনা ও শক্তিগুলিও এই প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কারণ আবিষ্কার করা এবং সেই কারণকে সমাজজীবন হইতে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটানোর পথেই সাধারণ মানুষ সেই কারণ হইতে উদ্ভূত স্বাভাবিক প্রতিফলকে সংকুচিত করিতে পারে এবং এমনকী সাময়িকভাবে ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীশক্তি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার মধ্য দিয়া একমাত্র আমাদের দেশে আমরা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব সংকুচিত করিতে পারি এবং এই পদ্ধতিতেই কার্যকরীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করিতে পারি।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে

কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দেশে এযাবৎকাল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি কর্তৃক পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়াছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে কখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয় নাই। এইপ্রকার অসম্পূর্ণ কর্মসূচি দ্বারা ঘোষিত লক্ষ্য পরিপূরিত হইতে পারে না। সুতরাং অতীতের ন্যায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ পরিপূরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করিতে হইবে যাহা আমাদের দেশে আজও অপূরিত রহিয়া গিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এই কাজ সমাধা না হইবে এবং জনসাধারণ ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, রীতিনীতি এবং চিন্তার বন্ধন হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন পর্যন্ত না সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদের গন্ডি অপসারিত হইবে এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক হইতে নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতেও গোটা জনসাধারণ সুসংবদ্ধ এক জাতীয় সত্তায় রূপান্তরিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত যথার্থ অর্থে সাম্প্রদায়িকতাকে নিশ্চিহ্ন করা যাইবে না। আমি এখানে পুনরায় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করিতে চাই যে, এই আন্দোলন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নহে। বরং এই আন্দোলন ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না এরূপ জনসাধারণ — উভয়েরই সমান অধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি জানি আগামী বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধর্মবিশ্বাস সমাজে বিরাজ করিবে। কিন্তু উহা ব্যক্তির একান্তভাবে নিজস্ব বিষয় হইবে। উহার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়াকলাপের উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। সুতরাং এই আন্দোলন ধর্মকে ইহার যথোপযুক্ত স্থানেই স্থাপন করিতেছে। কেহ এইভাবে যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন যে, যদি সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকে তবে উহা ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়াকলাপে প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য। আমি এরূপ ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি খুঁজিয়া পাই না। আমার মতে এই ধরনের চিন্তা ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে খোদ ধর্ম বলিয়া ভুল করার ফল। ধর্ম এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার — এই দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। ধর্মীয় প্রথা অতীতেও পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির সহিত সংগতি রাখিয়া আরও পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং যদি কেহ চলমান ধর্মীয় প্রথার পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা করেন তবে শুধুমাত্র সেইজন্যই তাহাকে ধর্মবিরোধী বা ধর্মপরিত্যাগকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় না। কামাল আতাতুর্ক আজীবন একজন খাঁটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও তুরস্কের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক ইসলাম ধর্মীয় প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নাই? নাসের কি একজন মুসলমান নন? তবুও কি তিনি নিজের দেশের বহু ইসলাম ধর্মীয় প্রথা ও চিন্তার অবলুপ্তি ঘটাইতেছেন না? প্রায় কোনপ্রকার প্রচলিত ইসলাম ধর্মীয় আচার(custom) প্রতিপালন না করার জন্য মহম্মদ আলি জিন্নাকে কোন মুসলমানই কি অমুসলমান বলিয়া মনে করিবেন? হিন্দুরা কি তাহাদের পুরনো বহু ধর্মীয় আচার পরিত্যাগ করেন নাই? গণতান্ত্রিক আন্দোলন অবশ্যই বর্তমান সামাজিক চাহিদার সাথে অসংগতিপূর্ণ ধর্মীয় আচার ও সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিবে। কিন্তু তাহার দ্বারা ধর্মবিশ্বাস বা সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হইবে-এ কথা বোঝায় না। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী আমাদের দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি কার্যে প্রয়োগে অক্ষম। একথাও বলা বাহুল্য যে, কোন ব্যক্তি যত শক্তিশালীই হউক না কেন, কাহারও একক প্রচেষ্টার দ্বারাও এই কাজ সমাধা হইতে পারে না। ফলে এই কাজ সমাধা করার দায়িত্ব একমাত্র ভারতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করিতেছে।

সুতরাং এই গণতান্ত্রিক সম্মেলন কেবলমাত্র যে আমাদের দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সহিতই নিজেকে যুক্ত করিবে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ইহার কর্মসূচিকে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ কর্তৃক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পরিচালিত আন্দোলনের কর্মসূচির সহিত যুক্ত করিবে তাহাই নহে, পরন্তু, পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের উপর ইহাকে মূলত নির্ভর করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই বোঝা দরকার যে, ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করিয়া এবং শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করার উপর এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নির্ভর করে না। সঠিক বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিই আমাদের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার একমাত্র

গ্যারান্টি। সুতরাং যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর কব্জা হইতে মুক্ত করা যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দাবিসমূহের ভিত্তিতে লড়াই করিতেছেন তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারে সেইরূপ কর্মসূচি এই গণতান্ত্রিক সম্মেলনে গ্রহণ করা উচিত। শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান ঘটানোর কথা চিন্তা করা অর্থহীন। কারণ একথা কে না জানে যে, আমাদের দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সংক্রামিত যাহা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। ঠিক একইভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য শুধুমাত্র মানুষের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করারও কোন অর্থ হয় না। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে শুভবুদ্ধির কোন অভাব নাই। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন উহা বিশেষ কোন কাজেই লাগে না। যতদিন পর্যন্ত না সাম্প্রদায়িকতার উৎসকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করিতে পারা যাইবে, যতদিন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে, আমাদের সমাজের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ যতদিন পর্যন্ত না ঘটানো যাইবে, এবং ধর্মকে নিছক মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে পর্যবসিত করা না যাইবে ততদিন পর্যন্ত অবস্থা বর্তমানে যে স্থানে আছে সেই স্থানেই থাকিবে।

কয়েকটি প্রস্তাব

সামাজিক পরিবেশ যাহাতে এইরূপ একটি অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে তাহার জন্য আমি নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করিতেছি ঃ —

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

২। সরকার কর্তৃক আয়োজিত অথবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত অনুষ্ঠানাদিতে কোনপ্রকার ধর্মীয় আচার-রীতিনীতি পালন করা চলিবে না।

৩। ভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে বিবাহের প্রসারের জন্য কার্যকরীভাবে উৎসাহ দিতে হইবে।

৪। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসবাদিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশার মনোভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকরী প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

৫। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও উহা সমাধানের পন্থা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে লইয়া জনসভা এবং ছোট ছোট ঘরোয়া আলোচনা সভা সংগঠিত করিতে হইবে।

৬। সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর লিখিত রচনাবলীসহ বিভিন্ন ভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। এই সমস্ত সাময়িক পত্রে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনকারী কোন রচনা প্রকাশ করা চলিবে না।

৭। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক গণকমিটি সর্বস্তরে গঠন করিতে হইবে। এই আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণ যাহাতে অংশগ্রহণ করে সেইদিকে বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে। এইসব সমিতিগুলি সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জুলুমের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে জনগণের প্রতিটি সংগ্রামকে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করিবে।

৮। যাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া চলিবে বা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিবে বা যাহাদের কাজ কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের সহায় হইবে, সামাজিক সম্মতি লইয়াই তাহাদের এমনকী যাহাতে সমাজচ্যুত পর্যন্ত করা যায় সেইরূপ মনোভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকরী প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

বন্ধুগণ, ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি করণীয় কাজ আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এখনকার মতো আমরা এইগুলি লইয়াই শুরু করিতে পারি। সর্বশেষে আপনাদের নিকট আমার পুর্নবার অনুরোধ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তিক্ত সমস্যার সমাধানে চিরাচরিত পথ অনুসরণ করিয়া ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়ার

পরিবর্তে যতটুকু সম্ভব সঠিক পথে কাজ শুরু করুন। জনসাধারণের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কথা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে ফাঁকা (vague) মানবিক আবেদন আমরা বহু শুনিয়াছি। সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির প্রশস্তিতে উচ্চারিত এই সমস্ত সস্তা বুক্‌নির পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাধা করার বাস্তব কর্মসূচি লইয়া এদেশের জনগণকে নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসুন। ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনের পক্ষ হইতে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত হইবে ইহাই আমি আশা করি।

বন্ধুগণ ও প্রতিনিধি ভ্রাতৃবৃন্দ আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ইতি —

৪৮, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১৩
১৫ নভেম্বর, ১৯৬৪

শিবদাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার

১৯৬৪ সালের ২৯ ও ৩০ নভেম্বর
দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক সম্মেলনে
পাঠের উদ্দেশ্যে প্রেরিত লিখিত ভাষণ।